ছায়াগৃহ

কৃষ্ণা রায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

ছায়াগৃহ	৭
বৃক্ষ-মানব	১৪
আবাদ	২১
পিঞ্জর-কথা	৩০
অশ্রুতিপর্বে	৩৩
জান্তব	৪২
মানবী	৪৭
হলুদ বর্ণের নারী	৫৩
শ্বেত-বসন্ত	৬২
চাঁপার গন্ধ	৬৮
অলজ্জ আঁধারে	৭১
এ-পরবাসে	৭৬

ছায়াগৃহ

ভোরবেলা অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তুন্‌তার। ঘরের মধ্যে ছোপ্‌ ছোপ্‌ অন্ধকার। জানলা গলিয়ে রাস্তার যে এক চিল্‌তে আলো ঢুকে পড়েছে, সেই আলোয় তুন্‌তা দেখল বাবা মশারি তুলে খাট থেকে নেমে যাচ্ছে। তার মানে বাবা কাল সারারাত তুন্‌তার সঙ্গেই শুয়েছিল। ইস্‌। কেন যে কাল রাতে অত তাড়াতাড়ি ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। বাবার গল্পের পুরোটা শোনাই হয়নি। কীসের যেন গল্প বলছিল বাবা...ভুরু কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করে তুন্‌তা—জ্যাক লন্ডন বলে সেই লোকটার কথা না? গল্পটা বাবা কি চমৎকার করেই না শুরু করেছিল। "জানো তুন্‌তা...জ্যাক লন্ডন ওয়াস্‌ অ্যা বয় উইদাউট বয়হুড়...মানে কী বলতো? বাল্যকাল হারা বালক...তার মানে হল এই যে অ্যামেরিক্যান লেখক জ্যাক লন্ডন ছোট্টবেলা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বুঝতেই পারেননি তাঁর জীবন থেকে ছেলেবেলাটা কখন টুপ্‌ করে খসে পড়েছিল। মনে করো তুমি খেলতে পাচ্ছ না, ইচ্ছেমতো গল্পের বই পড়তে পারছ না? মা-র আদর, আমার আদর পাচ্ছ না, কেমন লাগবে বলো তো?

"খুব বিচ্ছিরি।" তুন্‌তা চট্‌পট্‌ উত্তর দিয়েছিল।

"তাই তো তোমার মা-কে সবসময় বোঝাই—পড়া নিয়ে অযথা হইচই না করতে। আরে বাবা পড়ার জন্য আস্ত জীবন পড়ে আছে, কিন্তু খেলার জন্য? বুড়ো হলে খেলতে পারা যায়? আমি পারি বলো? তোমার মত এক্কা দোক্কা, গোল্লাছুট, খো-খো খেলেতে"?

বাবা এত ভালো বোঝে তুন্‌তাকে! মা যে কেন কিছু বোঝে না। বুঝতে চায়ও না। বাবা আজ সকালে চলে যাবে। আবার আসবে সেই শুক্রবার রাতে। আর এই পাঁচদিন শুধু মায়ের খবরদারিতে থাকা। খালি খালি শাসন "তুন্‌তা, এই টিভি সিরিয়াল-টা দেখো না, হোম-টাস্ক কেন রাতের মধ্যে শেষ করে রাখ না? বই-এর ব্যাগটা ওরকম ছুঁড়ে বিছানায় ফেললে কেন? ওকি! আবার পর্দায় ভিজে হাত-টা মুছছ"? ও! কেন যে বাবা সারা সপ্তাহ-টা থাকেনা! "উঠে পড়ো তুন্‌তা"। তুন্‌তা লেপটা টেনে আরও গুটিসুটি মেরে শোয়। ইস্‌। শীত করে না বুঝি এত সকালে বিছানা ছাড়তে! "ওঠো মামন, মা-র গরম গরম বকুনি দিয়ে দিন শুরু করবে নাকি"? বাবা কখন মশারির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—

তুন্‌তা দেখতে পায়নি তো!

"আমায় আজ যেতে হবে তো! আবার সেই শুক্রবার"...বাবা তুন্‌তার চুলে হাত বুলোয়। এই সময়টা ভীষণ বিচ্ছিরি লাগে তুন্‌তার। একটু পরে পাঁশুটে রঙের এই ফাইবারের অ্যাটাচি-টা নিয়ে বাবা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তারপর বাগানের বাঁশের বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে বলবে, "আসি মামন"...তখন খুব কষ্ট হয় তুন্‌তার। মায়ের জন্যও মায়া হয় তখন। বেচারা মা। সারাদিন হাসপাতাল, সংসার, রান্না, তুন্‌তা...ওর পড়া...সব সব মাকেই তো

দেখতে হয়। তবু তো দাদাটা এখন হোস্টেলে থাকে, মাঝে মাঝে তুন্‌তা দুষ্টুমি করলে মা রেগে গিয়ে বলে—"হ্যাঁ, আমি তো পাজি, খারাপ। আর তোর বাবা? সে খুব ভালো না? ও তোর বাবা না এ বাড়ির গেস্ট! তবু যদি সব জানতিস!"

কী জানত তুন্‌তা? মা যাই বলুক—বাবা খুব ভালো। গেটের মাধবীলতার ঝাড় পেরিয়ে কুয়াশা-মাখা রাস্তায় বাবার শরীরটা একসময় মিলিয়ে যায়। তুন্‌তা ঘরে এসে ক্যালেন্ডারে পেন দিয়ে দাগ টেনে দেয়। শুক্রবার। শুক্রবার রাতে বাবা একটা গিফ্‌ট পাবে। একটা ছবি—ওয়াটার কালার। বাবা চলে যাচ্ছে বাগান পেরিয়ে—সাপ লুডোর মতো রাস্তা পেরিয়ে...ছবির নাম দেবে...কী দেবে? যাক্‌গে! ওটা পরে মা-কে জিগ্যেস করলেই হবে।

—অ্যাই তুন্‌তা খেল্‌তে যাবি না?

—না, ভালো লাগছে না। তাছাড়া মা এখন বাড়ি নেই।

—কেন কাকিমার বুঝি আজ ইভনিং ডিউটি? চল না, ছুটে হাসপাতালে গিয়ে বলে আসি, তারপর তুই আর আমি ...

—নারে, মা বাজার গেছে। আর আমি এখন ছবি আঁকছি। বুলান, তুই খেলতে যা না।

—দেখি দেখি কী আঁকছিস।

—না, দেখাব না।

—অ্যাঁ...ভারি তো ছবি। দে শিগগির।

মেয়ে হলেও বুলানের চেহারা বেশ শক্তপোক্ত। তাছাড়া তুন্‌তার চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ে, বয়সে কিছুটা বড়োই হবে। ধ্বস্তধ্বস্তিতে তুন্‌তার আঁকার খাতার মলাট-টা ছিঁড়ে যায়। তুন্‌তার খুব রাগ হয়। ক্লাস ফোরে উঠে বুলানের মাতব্বরি একটু বেড়েছে। কিন্তু কিছ্ছু করার উপায় নেই। ওর সঙ্গে ঝগড়া করলে মা উলটে তুন্‌তাকেই বকবে। বুলানরা তুন্‌তাদের পাশের কোয়ার্টারে থাকে। ওর বাবা হাসপাতালের স্টোরকিপার। মা প্রায়ই বলে—নতুন জায়গায় এসেছি, আপদ-বিপদে আমার তো প্রতিবেশীরাই ভরসা। তুমি আবার তাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিও না!" তবু তুন্‌তা না বলে পারে না—যা যা ক্লাসে পড়া পারিস না, রোজ কান ধরে দাঁড়াস, দাঁড়া না, সব্বাইকে বলে দেব। আর আমার আঁকার খাতা ছিঁড়লি—বাবা আসুক, তারপর তোর বাবাকে সব বলে দেবে আমার বাবা।

—হুঁ! তোর বাবা? তোর বাবা-টা আবার কে রে তুন্‌তা?

—এই! আমার বাবাকে তুই চিনিস না? তুন্‌তা অবাক।

—হ্যাঁ, তোদের বাড়িতে অবশ্য প্রতি শুক্রবার রাতে একটা লোক আসে। তবে সেটা তোর বাবা জানব কী করে?

আমার মা, পাশের ফ্ল্যাটের শিপ্রা-কাকিমা সবাই বলে ওটা তোর বাবা হতেই পারে না!—বুলান মুচকি মুচকি হাসে।

—সত্যি তুই না একটা...তুই জানিস না, আমার বাবা কলকাতায় বড়ো চাকরি করে? তুন্‌তা রাগে হাঁফায়।

—তাহলে তোরা কলকাতায় থাকলেই তো পারিস। এই গাঁইয়া জায়গায় পড়ে আছিস কেন?

—তুই আমায় নতুন দেখছিস নারে বুলান? জানিস মা-র হাসপাতালের চাকরি থেকে বেশি ছুটি পাওয়া যায় না?

—তাহলে তুন্‌তা, তোর মা এবার ছুটি পেলে কলকাতায় ঘুরে আসিস কেমন? নিক্কো পার্ক, অ্যাকোয়াটিকা...তোর ঐ বাবাকে বলিস...সব দেখিয়ে দেবে! আমাদের বাবারা কিন্তু ওসব দেখায়।

বুলানটা ভীষণ হিংসুটে। তুন্‌তার বাবা কখ্‌খনো তুন্‌তাকে বকে না, মারে না—সেটাই বুলানের হিংসের বড়ো কারণ।

শুক্রবার সন্ধেটায় কিছুতেই পড়ায় মন বসে না তুন্‌তার। দশ মিনিট পর পর বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। কলকাতার ট্রেন এখনও এল না কেন? মা-কে উত্যক্ত করে মারে। এক একদিন ট্রেনটা সত্যি সত্যিই অনেক দেরি করে। তুন্‌তা পড়ার টেবিলে বসে ঢোলে।

—তুন্‌তা।

—ওই তো! বাবা এসে গেছে! বাব্‌বা রে—আজ কত দেরি হল। আরে। এত্‌ত বড়ো কেক? ও মা, দেখে যাও, শিগ্‌গির। ইস্‌! বজ্জাত বুলানটাকে যদি এটা দেখানো যেত। বলে কিনা তোর বাবাটা আবার কে রে? একদিন এমন হাত মুচড়ে দেবে না!

—কী রে? বিড়বিড় করে কার সঙ্গে ঝগড়া করছিস? মা নাকি?—বাবা হাসে।

—না, ও কিছু না। কিন্তু আজ তো বড়ো দিন নয় বাবা। —তুন্‌তা নিজের বিস্ময় গোপন করে না।

—হ্যাঁ মা, এবারে বড়ো দিন পড়েছে মঙ্গলবার। রোববার হলে কি ভালো হত বলতো তুন্‌তা!

—না হোকগে। মা এবার ঠিক ছুটি নেবে। তারপর আমরা সবাই মিলে কলকাতায় বড়ো দিন দেখব। নিক্কো পার্ক, অ্যাকোয়াটিকা...দাদাকে হস্টেল থেকে দুদিনের জন্য নিয়ে আসবে, তারপর...আমরা সবাই যাবতো বাবা?

—দেখি।

এইটাই বাবার দোষ। কোথাও যাওয়ার কথা হলেই মুখ হাঁড়ি। খালি একটাই কথা—'আমার সবচেয়ে প্রিয় বেড়ানোর জায়গাতো একটাই। বিছানায় আমার তুন্‌তার পাশের বালিশটায়। ওখানে মাথা রাখলেই আমি সারা পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় পাই।'

—আমি কিন্তু আর এত ঢাকাঢুকি দিতে পারছিনা। মেয়ে বড়ো হচ্ছে, কত রকম প্রশ্ন এখন মনে। ক'দিন ধরেই মুখে এক বুলি—মা এখানে ভালো লাগছে না, কলকাতায় বাবার কাছে থাকব। তোমার হাসপাতালে চাকরি করার কী দরকার?

—ছেলেমানুষ তো একটু আধটু জেদ, বায়না করবেই। তুমি উসকুনি না দিলেই হল।

'—আমি? আমি কেন উসকোনি দেব? তোমার কাছে কোনদিন কোন্‌ সুখটা পেয়েছি যে আজ ঘটা করে কিছু চাইতে যাব?' মায়ের গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজে তুন্‌তার ঘুম ভেঙে যায়। রোববার রাত্তির যত ঘন হয়, মা বাবার ঝগড়া-ঝাঁটি ততই বাড়তে থাকে। আগেও দু-একদিন ওদের ঝগড়ায় ঘুম ভেঙে গেছে তুন্‌তার। আচ্ছা, এমন কথা-কাটাকাটি হলে তুন্‌তা ঘুমোয় কেমন করে? অবশ্য ঘুমোলেই তো সকাল, আর বাবার চলে যাওয়ার সময় হয়ে যাবে। তার

থেকে লেপের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ওদের কথা শোনা মন্দ কী? সারাদিন তো এমন রাগ রাগ গলায় দুজনে কথা বলেনা। তুন্‌তা একটু অবাক-ই হয়।—"চাইবে না, চাওয়ার কোন বিষয় তোমার অন্তত নেই।" এইরে। এবারে বাবার গলাও জোরালো হচ্ছে, তুন্‌তার বেশ ভয় ভয় করে। কিন্তু ওরা এরকম করছে কেন? এই তো সন্ধেবেলায় তিনজনে বসে লুডো খেলা হল, মা গরম বেগুনি, মুড়ি আর চা দিল সক্কলকে। বাবাও তো কেমন হেসে হেসে বলছিল—সুমনা, কলকাতায়, তোমার এই বেগুনিটা কিন্তু ভীষণ মিস করি।

—হ্যাঁ, আমি চাইব তোমার কাছে? সত্যি হাসালে তুমি। ছেলে বড়ো, সব বোঝে, কিন্তু ছোট্ট একরত্তি এই মেয়েটার জন্য তোমাকে আমার দরকার এটা বুঝে গেছ বলেই...

—কেন? ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরও তোমার শর্ত-মাফিক সম্পর্ক আমি রাখছি না? সপ্তাহে দুদিন আমি আমার ফ্যামিলিকে স্যাক্রিফাইস করছিনা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথা তো আজ বলবেই। বারো বছরের ছেলে, পাঁচ বছরের মেয়েকে ছেড়ে বাবু ফুর্তি করে বেড়ালেন। তারপর আরেকটা নতুন সংসার পাতলেন—আর আমি শুধু সারাজীবন জোয়াল ঠেলে যাব, না? শখ নেই, আহ্লাদ নেই নিজের বুড়ো মা-কে পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গিয়েছিলে লজ্জা করে না?

—মা তোমায় সত্যিই ভালোবাসতেন সুমনা। নইলে আমি কি আর মা-কে আমার কাছে নিয়ে যেতে পারতাম না।

—থাক্, তিনি তাড়াতাড়ি চলে গিয়ে ভালোই হয়েছে। তোমার সুখের সংসারের গৃহিণী কি আর এত উপদ্রব সহ্য করতেন।

—সুমনা, মন্দিরা-কে নিয়ে তুমি একটা কথাও বলবে না, আমি তোমায় আবার সাবধান করে দিচ্ছি।

—না! সে সব সুখ ভোগ করবে, আর আমি শুধু তোমাদের শান্তির জন্য সাধ করে এই পাড়াগাঁয়ের হাসপাতালে ট্রান্সফার নেব তাই না?

—থামো থামো! তোমার এই নাকে-কান্না অসহ্য লাগে আমার। ডিভোর্সের প্রসঙ্গ তুমি-ই তুলেছিলে, মন্দিরা সব জেনে শুনেই আমায় গ্রহণ করতে রাজি ছিল। মন্দিরার সঙ্গে তোমার তুলনা আসেনা বুঝলে? তোমার জন্য প্রতি শনি রবিবারের ছুটির মজা মেয়েটা স্যাক্রিফাইস করছে। কোথায় ওর কাছে একটু কৃতজ্ঞ থাকবে তা না...

—অনেক হয়েছে। হিপোক্রিট, বদমাইস কোথাকার। লজ্জা করেনা—এখানে এই দুদিন থাকার শর্তে তুমি কোর্টের আইনমাফিক টাকা দিতে চাওনা। ভুলে যাও সে সব। ছেলে মেয়ের খরচের সিংহভাগ আমার। তোমার মন্দিরাকে জিগ্যেস করো,—আমার স্যাক্রিফাইসটা কিছু কম কি না!

—ঠিক আছে, এবার থেকে আইন-মাফিক টাকা তুমি পাবে, আমি নিয়ম করে আর আসব না।

—বেশ তো, সেটা মেয়েকে এখ্‌খুনি জানিয়ে দাও। হুঁ। মেয়ের সামনে কত আদিখ্যেতা—মামণি, মামণি! দাঁড়াও না সব বলে দেব ওকে এখ্‌খুনি। একটা মেয়েকে রাজার হালে রাখবে...আর আরেকটা...সারাটা সপ্তাহ পথ চেয়ে থাকে, কটি টফি, লজেন্স,

পেন্সিল, ড্রয়িংখাতা...কত অল্পে খুশি...তোমার একটুও বিবেকে লাগেনা ওই আটবছরের কচি মেয়েটার কাছে ভড়ং করতে?

—গলাটা নামাও সুমনা। তুন্‌তা জেগে উঠবে।

—জাগুক, জাগতে তো হবেই একদিন। বাবার আরেকটা সংসার, আরেকটা মেয়ে—তার অমন ঘটা করে পাঁচবছরে জন্মদিন হল...আমি কি খবর পাইনা ভেবেছ। শুধু এখানে খরচ করতেই যত কষ্ট। শোনো—তোমার ওই মিঙ্কার কথা। আমি ওকে কাল সকালেই জানিয়ে দেব। কখন জানো? যখন যাবার আগে মেয়েকে নিয়ে আদিখ্যেতা করবে—ঠিক তখন, বুঝলে?

মার গলটা ক্রমশ অত রাগী রাগী হয়ে উঠছে কেন? বাবা-ই বা হঠাৎ চুপ করে গেল কেন? মিঙ্কা কে? বাবার কেউ হয় নাকি? তুন্‌তার ঘুম এখন ভেঙে গেছে পুরোপুরি।

—উঠে পড়ো তুন্‌তা। সকাল অনেকক্ষণ হয়ে গেছে মামণি। আজ স্কুল আছে না?

বাবার গলা। অ্যালার্ম-বেল কি বেজেছিল আজ? কাল রাতে অনেকক্ষণ জেগেছিল তুন্‌তা। কেন? ভুরু কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করে।

'—কী হোল মামন? আমায় আটটার বাস ধরতে হবে না'? বাবার গায়ে কী সুন্দর একটা গন্ধ। এত সকালেই চান করেছে বাবা। ঝুঁকে পড়ে তুন্‌তার মাথায় হাত বুলোয় বাবা। ওঠো মামন। তুমি ব্যাগ হাতে এগিয়ে না দিলে যাই কেমন করে?

—আজ না গেলে কী হয়?—তুন্‌তা ম্লান হাসে।

'—অফিস আছে না মামনি'? বাবা সব সময় এত নরম গলায় কথা বলে—অথচ কাল রাতে...কলকাতার বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বাবা কি সেই মিঙ্কার সঙ্গেও এই রকম করেই কথা বলে?

—কিরে পড়তে বসবি না? হ্যাঁ, আমার কিন্তু আজ ইভনিং-ডিউটি। স্কুল থেকে ফিরেই আজ আর খেলতে যাস না। কাজের মাসি পাঁচটার মধ্যেই আসবে। তারপর বেরোস।

মা-র দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বাবা বলল, 'সত্যি সুমনা, কত কী যে তোমায় খেয়াল রাখতে হয়। কিন্তু কাজের মাসিকে এক্সট্রা একটা চাবি দিয়ে রাখলেই তো পারো। মেয়েটা তাহলে বিকেলে একটু নিশ্চিন্তে খেলতে পারে।'

বাবার কথায় মা খেঁকিয়ে ওঠে, থাক্ থাক্, তোমার আর দরদ দেখাতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না, ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাবে।

মা আজকাল অল্পতেই রেগে ওঠে। মিঙ্কার মা-ও কি এরকম রাগ করে? মিঙ্কার মা-কে কেমন দেখতে কে জানে! মা তো কখনই খুব একটা সাজেনা। মাঝে মাঝে মর্নিং ডিউটি থাকলে বিকেলবেলা মা খুব সুন্দর একটা ফিকে গোলাপি রঙের শাড়ি পরে। কী যে ভালো দেখায় তখন। তুন্‌তার স্কুলের বন্ধুরা প্রায়ই আলোচনা করে—কার মা-কে কেমন দেখতে। সুদেষ্ণার মা-কে দেখতে ঠিক মাধুরী দীক্ষিতের মতো, অন্বেষার মা-ও খুব সুন্দর। আনন্দিতা বলে—"উপায় থাকলে আমার মা-কে বদলে নিতাম। মায়ের চেহারাটা আমার ঠিক পছন্দ হয় না।" তুন্‌তার এসব কথা ভালো লাগে না। মা আবার পছন্দ-অপছন্দের জিনিস নাকি?